আলি : বিযুক্তির নির্মম ধারাভাষ্য

শৌভ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের রাষ্ট্রে এবং সমাজে, এমনকী সেই সুবাদে আমাদের ঘরগেরস্থালিতেও, একদল বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে অথবা একটি বিশেষ ধারণাসমষ্টিকে দূরে সরিয়ে রাখার অথবা তাদের অপাঙক্তেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস নতুন নয়। দূরে সরিয়ে রাখা, কারণ এরা আমাদের সযত্নলালিত ভালো-মন্দের ধারণার পরিপন্থী, কারণ এরা বারবার আমাদের তথাকথিত মূল্যবোধগুলিকে আঘাত করে, চ্যালেঞ্জ জানায় তাদের সারবত্তাকেই। একটু অন্যভাবে খতিয়ে দেখলে এটা মনে হওয়াও কিছু অস্বাভাবিক নয় যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, এই বিযুক্তিকরণ (Alienation) প্রক্রিয়াটাই গড়ে-পিটে বানিয়ে তুলছে আমাদের ভালো-মন্দ, শুভাশুভের ধারণাবিশ্বটিকে। অর্থাৎ কি না, জগৎ সম্পর্কে আমাদের একটি সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে তার বিপ্রতীপ মতবাদগুলিকে নাকচ করার, অস্বীকার করার, এবং শেষমেষ তাদেরকে 'নেই' করে দেবার একটা অদম্য প্রবণতা। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই তৈরি হতে থাকে ক্ষমতার বয়ান (Discourse) এবং একইসঙ্গে ঘটে যেতে থাকে তার বৈধকরণ (Legitimisation)।

একটি চলচ্চিত্রের আলোচনা করতে বসে এহেন কচকচি অনেকের কাছেই বাহুল্য মনে হতে পারে। কিন্তু আদতে এটুকু ভণিতার দরকার ছিল, বিশেষতঃ ছবিটি যেখানে রাইনার হ্যের্নার ফাসবিন্ডারের *আলি: ফিয়ার ইটস দ্য সোল (Angst Essen Seele Auf)*। কারণ, ফাসবিন্ডারের ছবিটি এই সামাজিক বিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার একটি সোচ্চার ধারাভাষ্য। আমরা দেখব যে গোটা ছবিটি জুড়ে এই বিযুক্তির তিনটি স্তর ফুটে ওঠে . . .

ক) জাতিবর্ণগত বিযুক্তি

খ) যৌনতাভিত্তিক বিযুক্তি

গ) আত্মবিযুক্তি

এদের মধ্যে প্রথম দুটি স্তর, জাতিবর্ণগত বিযুক্তি এবং যৌনতাভিত্তিক বিযুক্তি, পরস্পর পরস্পরের দ্বারা অতিনির্ণীত (Overdetermined)। অর্থাৎ, জাতিবর্ণগত বিযুক্তির ক্ষেত্রে একটা বড় হাতিয়ার যৌনতা, বিশেষতঃ সেই যৌনতা যা সমাজকর্তৃক অনুমোদিত নয়। অন্যদিকে, যৌনতাভিত্তিক বিভাজন প্রক্রিয়াটিও জাতিবর্ণের ধারণার ওপর নির্ভরশীল। এ নিয়ে আমরা পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করব।

বর্তমান নিবন্ধটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে কাহিনীর সংক্ষেপসারটি তুলে দেওয়া হবে সেইসব পাঠকের সুবিধার্থে, যাঁরা ছবিটি দেখেননি। পরবর্তী ভাগে আমরা এই বিযুক্তির বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করব, অবশ্যই *আলি: ফিয়ার ইটস দ্য সোল* ছবিটির পরিপ্রেক্ষিতে। আমরা দেখব কীভাবে এই বিযুক্তির ধারণাটিকে পরিচালক উপস্থাপন করেছেন তাঁর ছবিতে, কাহিনী এবং প্রকরণ উভয়ের মাধ্যমেই। প্রসঙ্গত উঠে আসবে বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের কূটকচাল এবং অবকাশ থাকবে বিতর্কেরও। আর অবশেষে আমরা বুঝে নিতে চেষ্টা করব বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ছবিটির প্রাসঙ্গিকতাটুকু।

কাহিনীসার

১৯৭৪ সালে নির্মিত ফাসবিন্ডারের এই ছবির কেন্দ্রে রয়েছে এক বিগতযৌবনা জার্মান মহিলা — এমি। প্রৌঢ়াই বলা চলে তাকে, বয়স ষাটের কাছাকাছি। তার ছেলেমেয়ে আলাদা থাকে, সবাই ব্যস্ত নিজেদের জীবন-জীবিকা নিয়ে। এমি নিজেও একটি আপিশে জানলা-দরজার কাঁচ পরিষ্কার করে নিজের খরচ চালায়। একদিন এক ছোট্ট বারে, যেখানে সে বৃষ্টির জন্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, তার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায় আলি নামের মরোক্কান যুবকটির যে কর্মসূত্রে জার্মানিতে অভিবাসী। এই বারটির মূল খদ্দের সে এবং তার মতো আরো কিছু অভিবাসী মুসলিম। এমির সঙ্গে আলির পরিচয় গাঢ় হলে সে জানতে পারে যে আলি তার পাঁচজন বন্ধুর সঙ্গে একটি ছোট ঘর ভাড়া করে থাকে। এমি, সহৃদয়তাবশতঃ, আলি-কে তার বাড়িতে এসে থাকতে অনুরোধ করে। আলি এবং এমি, দু-জনের মধ্যেই এক তীব্র নিঃসঙ্গতাবোধ ব্যাপ্ত হয়ে ছিল এতদিন, আর সেটাই হয়তো এই দু-জন অসমবয়েসী এবং ভিন্ন জাতিধর্মের মানুষকে কাছাকাছি নিয়ে আসতে সাহায্য করল। এতদূর যে, কোনো-এক হঠকারী মুহূর্তে এমি জানায় যে সে আলি-কে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। আলি খুব সহজভাবে এবং উৎসাহের সঙ্গেই এই প্রস্তাব সমর্থন করে।

প্রথম থেকেই আলি এবং এমির এই সম্পর্ক এমির পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজনের কাছে কঠোর সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বস্তুতঃ, জার্মানদের কাছে আলি-র মতো অভিবাসীরা অবাঞ্ছিত এবং সামাজিকভাবে অপাঙক্তেয়, অতএব এই অসম সম্পর্কের জেরে তারা এমি-কেও বয়কট করে। আর এখান থেকে শুরু হয় সমাজের ক্ষমতাকেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে এমি এবং আলির আপোষবিহীন লড়াই। এক সময় ক্লান্ত এমি পালিয়ে যেতে চায়, দূরে কোথাও। যেখানে প্রত্যেক মুহূর্তে সমাজের তর্জনির কাছে মাথা নিচু করতে হবে না। আলি তার কথায় রাজি হয়।

তারা যখন ফিরে আসে, তখন দেখে সবকিছু কেমন বদলে গেছে। যারা এতদিন তাদের একঘরে করে রেখেছিল, এখন তারাই ফিরে আসে বিভিন্ন সুযোগসুবিধার লোভে। ভুলে যেতে চায় পুরোনো বিদ্বেষ। এমি ফের তার আগের সামাজিক অবস্থানে ফিরে আসে। কিন্তু অন্যদিকে, আলির সঙ্গে তার সম্পর্কও আর আগের মতো থাকে না। বাইরের বিরোধিতা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাঝখানেও একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়, আলগা হয়ে পড়ে তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের ঠাসবুনোট। তাদের সামাজিক অবস্থান যে আলাদা এবং তারা যে দুটো আলাদা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতিভূ, সেই উপলব্ধিটা নতুন করে সামনে চলে আসে, এবার আর বাইরের তাড়নায় নয়, বরং নিজস্ব চেতনায়। ছবির শেষে অবশ্য আমরা এমি এবং আলিকে আবার কাছাকাছি ফিরে আসতে দেখি, পারস্পরিক নির্ভরশীলতায়, যৌথ উত্তরণে।

বিযুক্তির স্বরূপ

১

ছবিতে আমরা দেখি, এমির নিকটজন যারা, অথবা যারা তার প্রতিবেশী কিংবা সহকর্মী, আলির পরিচয় জানা মাত্রই তারা বিস্ময়ে-ঘৃণায় হতবাক হয়ে যায়। একই সঙ্গে, আলির প্রতি তাদের বিদ্বেষও চাপা থাকে না। এই পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও বিদ্বেষের নিরাবেগ রূপায়ণই যেহেতু *আলি: ফিয়ার ইটস দ্য সোল*-এর চালিকাশক্তি, তাই এর সঠিক চরিত্র বুঝে নেওয়া আমাদের দরকারি বলে মনে হয়।

একটু খেয়াল করে দেখলে বোঝা যাবে যে, ছবিটিতে ভিন্নধর্মমতাবলম্বী অভিবাসীদের প্রতি এই রাগ এবং ঘৃণার দুটি স্তর রয়েছে। একদিকে 'বিশুদ্ধ' জার্মানরা এদের দেখছে অনাহুত,

অবাঞ্ছিত আগন্তুক হিসেবে, যারা *অন্যায়ভাবে* তাদের কল্যাণরাষ্ট্রের (Welfare State) সুযোগসুবিধায় ভাগ বসাচ্ছে, কোনোরকম প্রতিদান ছাড়াই (উদাহরণ, এমি-র এক সহকর্মীর উক্তি, ''ওরা কাজ করে না ছাই! স্টেশনে গিয়ে দেখো, জঞ্জালের স্তূপ। ওদের একজনও কাজ করে না। আর আমাদের ঘাড়ে বসে বসে খায়।'')। অন্যদিকে, ক্ষোভের আরেকটি স্তরে এই খাঁটি জার্মানরাই মনে করছে যে অভিবাসীরা তাদের জন্যে বরাদ্দ চাকরিবাকরি দখল করে নিচ্ছে, এবং, ফলতঃ রুদ্ধ করছে তাদের উন্নতির পথ (উদাহরণ হিসেবে মনে আসবে, এমি-র মেয়ে ক্রিস্টার স্বামীর আপিশে তার ওপরওয়ালা হিসেবে একজন তুর্কীর নিয়োগ নিয়ে তার বিষোদগার)।

এই যে পরস্পরবিরোধী দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর অনায়াস সহাবস্থান, স্লাভো জিজেক (Slavoj Zizek) এটাকে বর্ণবিদ্বেষ (Racism) এবং অনার্য-বিরোধিতা (Anti-semitism) উভয়েরই অন্তর্গত স্ববিরোধ বলে মনে করেন। স্ববিরোধ, কেননা যদি এই অভিবাসীরা রাষ্ট্রের সুযোগসুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়েই বেঁচে থাকে, তাহলে স্পষ্টতঃই তারা জীবিকানির্বাহের জন্য কোনোরকম কাজকর্মে উৎসাহী নয়, ফলতঃ চাকরিদখলের প্রশ্নটি অবান্তর; আর যদি তারা সত্যিই পরিশ্রম করে এবং তারই ফলস্বরূপ জার্মানরা চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে এই অভিবাসীরা রাষ্ট্রের সুযোগসুবিধা অন্যায়ভাবে ভোগ করছে, এ-কথা বলার যুক্তি থাকে না। জিজেক মনোবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমাদের বুঝতে সাহায্য করেন কীভাবে একটি 'সাবজেক্ট' এইরকম পরস্পরবিরোধী ধারণাসমষ্টিকে নিজের মধ্যে লালন করতে সক্ষম হয়।

শুরুতেই, 'সাবজেক্ট' টি এই ভিন্নবর্ণের মানুষদের দেখে একটি সঙ্ঘবদ্ধ 'অপর' (Other) হিসেবে। এর বিপরীতে সে খাড়া করে নিজের 'আত্মন' (Self)। 'অপর'-এর থেকে স্বভাবচরিত্রগতভাবে নিজেকে আলাদা প্রতিপন্ন করার মধ্যে দিয়েই 'আত্মন'-এর হয়ে ওঠা।

অতএব, একটি বর্ণবিদ্বেষী কাঠামোয় 'অপর' চিহ্নিত হয় বিভিন্ন নিকৃষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা। ছবি থেকে কিছু টুকরো সংলাপ উদ্ধৃত করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে —

ক) 'নোংরা শুয়োর ওরা। যেভাবে থাকে! একই ঘরে গাদাগাদি করে পুরো সংসার। পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না।'

খ) 'ওদের মাথায় মেয়ে ছাড়া আর কোনো চিন্তাই নেই।'

গ) 'একবার কাগজ খুলে দেখো, খালি ধর্ষণের খবর।'

ঘ) 'ওরা সে' ছাড়া আর কিছুই চায় না।'

এখানে দুটো জিনিস লক্ষ্য করার। প্রথমতঃ, 'অপর'কে উপস্থাপিত করা হয় এমন এক সত্তা হিসেবে যা কিনা সমস্ত আইনকানুন এবং নীতিবাগীশতার গন্ডী লঙ্ঘন করে যায়, এমনকি, তাকে অগ্রাহ্য করে অনায়াসে। আর সেই কারণেই এদেরকে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিযুক্ত করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, এই অভিবাসীদের বারবার তুলনা করা হয় মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে, বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তারা আদৌ মনুষ্যপদবাচ্যই নয়। এর ফলে, তাদের মূলস্রোত থেকে সরিয়ে দেওয়া বা বিযুক্ত করার কাজটা যুক্তিসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং ব্যাপারটা আর ততখানি *অমানবিক* থাকে না। অর্থাৎ, এখানে একটি উভমুখী প্রক্রিয়ার সূচনা হল, যেখানে একদিকে, অভিবাসীদের মনুষ্যেতর প্রাণীর সমতুল্য হিসেবে দেখা হতে লাগল এবং অন্যদিকে, তাদের ক্ষমতাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে উপস্থাপিত করা হল। কারণ, যদি একটা শ্রেণী এতটাই নগণ্য এবং তুচ্ছ হয় তাহলে তাদের সামাজিকভাবে নিকেশ করা নিয়ে এত মাথাব্যথার আর অবকাশ থাকে না। সেক্ষেত্রে, সমাজের পক্ষে এরা আদৌ কোনো বড় বিপদ নয়। কিন্তু যখনই তারা কোনো না কোনোভাবে *আমাদের* চেয়ে বেশী শক্তিশালী, যখনই তারা আমাদের নিয়মনীতি ভাঙার ক্ষমতা রাখে, তখনই তাদের অস্তিত্ব আমাদের সুস্থ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে

দাঁড়ায়। তারাই *আমাদের* বঞ্চিত করে রাখে *আমাদের* ন্যায্য প্রাপ্য থেকে। অতএব, তখনই *আমরা* ঝাঁপিয়ে পড়ি এই অবাঞ্ছিতদের আলাদা করার, বিযুক্ত করার কাজে।

অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে আইন— সেইসব নিয়মকানুনের গন্ডী যা সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করতে সদাতৎপর—তার শক্তি সংগ্রহ করে বিযুক্তিকরণের মাধ্যমেই। যাকে বিযুক্ত করতে চাওয়া হচ্ছে, তাকে যতই শক্তিশালী হিসেবে দেখানো হবে, আইনের পরাক্রম ততই ফুলে-ফেঁপে উঠবে।

'আত্মন' এবং 'অপর'-এর এই পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং অসহযোগিতামূলক ব্যবহার ফাসবিন্ডার কিছু অসাধারণ দৃশ্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। একটি দৃশ্যের কথা বলা যাক। এখানে আমরা দেখি আলি এবং এমি খোলা আকাশের নিচে একটি কাফেটেরিয়ায় বসে আছে। লং শটে তাদের ধরা হলে দেখা যায় চারপাশে ফাঁকা চেয়ারটেবিলের ভিড়ে আলি আর এমি একা, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। আলি কাঁধের ওপর দিয়ে ক্যামেরার উল্টোদিকে তাকায়, আউট অফ দ্য ফ্রেম। পরের শটে এমির দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখি, আলির পেছনে, দূরে, দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে অনিচ্ছুক পরিবেশনকারীর দল— 'অপর'-এর বিরুদ্ধে 'আত্মন'।

অন্য একটি শটে ফাসবিন্ডার, এমন কি, দর্শককেও রেহাই দেন না, শামিল করে নেন তাঁর বিযুক্তির খেলায়। এই দৃশ্যে এমি আর আলি, তাদের আইনি বিবাহের পর একটি অভিজাত রেস্তোরায় ঢোকে। এমির সংলাপে আমরা জানতে পারি এখানে স্বয়ং হিটলারও খেতে আসতেন। তখন স্বভাবতই, এই বিযুক্তির প্রক্রিয়াটিকে নব্য-নাৎসিবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রচেষ্টাটি গোপন থাকে না। রেস্তোরার স্বল্পভাষী ওয়েটারের সূক্ষ্ম বিদ্রূপ এমিকে অস্বস্তিতে ফেলে। এর পরেই একটি লং শটে দরজার ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে আলি এবং এমিকে পাশাপাশি

বসে থাকতে দেখা যায়, সটান ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে। বেশ কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয় শটটি। এবং দর্শক হিসেবে আমাদের মনে হয় আমরাই যেন এমি আর আলির আসল প্রতিপক্ষ। আমরা শুধু ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করছি তা-ই নয়, বরং এই লক্ষ্য করার মধ্যে দিয়েই তাদেরকে আলাদা করে ফেলছি বিমূর্ত জনসমষ্টি থেকে, 'অপর' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছি। অর্থাৎ, দর্শক হিসেবে আমরা আর নির্বিকার থাকতে পারছি না, ফাসবিন্ডার জোর করেই আমাদের নামিয়ে দিচ্ছেন এই সম্মুখসমরে বাধ্য করছেন।

২

পাঠক নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে কিছু আগে যেসব সংলাপ বা টুকরো সংলাপ উদ্ধৃত হয়েছিল, তাতে বারবার যৌনতার অনুষঙ্গ ঘুরেফিরে এসেছে। আগেই বলেছি, বিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় যৌনতা একটা বড় হাতিয়ার। এই ব্যাপারটা খোলসা করার জন্যে একটু অন্য প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করি।

এটা তো জানা কথাই, যে কোনও প্রভুত্বকামী (Authoritarian) সমাজ মানুষকে কিছু নিয়মশৃঙ্খলার নিগড়ে বেঁধে ফেলতে সচেষ্ট থাকে; এইটা ভালো আর ওটাই মন্দ এই ধরণের ফতোয়ার নাগরিকসমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে একটি ইডিওলজিকাল হেজিমনি তৈরি করাই তার লক্ষ্য। কিন্তু এটা সে করে কীভাবে? আর কেনই বা এইসব ফতোয়া মেনে নেয় মানুষ? একটি সমাজ যতোই প্রভুত্বকামী হোক না কেন, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মানুষের সমর্থন এবং অংশগ্রহণ তো আবশ্যিক। বস্তুত, এইখানেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সামাজিক বিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াটি। অর্থাৎ, যদি মানুষকে বোঝানো যায় যে কোনো একটি বিশেষ সম্ভোগসুখ (Enjoyment) থেকে তারা বঞ্চিত, কারণ সেটি অধিকার করে নিয়েছে *অন্য কেউ,* তাহলে

রাষ্ট্র বা সমাজের ওপর থেকে নাগরিকদের সন্দেহ মুছে যায় এবং তা গিয়ে পড়ে সেই *অন্য কারোর* ওপর। এই *অন্য কেউ* হল সেই 'অপর' যার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এইভাবে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করা ক্ষমতা এবং পৌরুষের দৃশ্যপ্রতিমাটি (Image) সংখ্যালঘু 'অপর'-এর ঘাড়ে ন্যস্ত হয়। জিজেকের মতে, বর্ণবিদ্বেষ বা অনার্য-বিরোধিতার পেছনেও এই প্রক্রিয়াটি ক্রিয়াশীল। *আমার* কাছে যে সুখ নেই, সেই সুখ *ওদের* করায়ত্ত, *ওরা* তা চুরি করে নিয়েছে *আমার* কাছে থেকে, এই বোধ বর্ণবিদ্বেষী কাঠামোটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য জরুরি। জিজেক বলেন, সমাজকাঠামোকে যা টিকিয়ে রাখে, সেটা হলো —

> not so much identification with the public or symbolic Law that regulates the community's 'normal' everyday life, but rather *identification with a specific form of transgression of the Law, of the Law's suspension* (in psychoanalytic terms, with a specific form of enjoyment. (1994:55)

অর্থাৎ, *অতিরিক্ত* আনন্দের (যা সমাজের পক্ষে, তার হেজিমনির পক্ষে হানিকর এবং যা *আত্মনের* করায়ত্ত নয়, অথচ যে আনন্দের প্রতি তার একটা সুপ্ত আকর্ষণ আছে) ধারণাটিকে এই কাল্পনিক 'অপর'-এর (যে 'অপর' একই সঙ্গে মনুষ্যেতর এবং অতিমানবিক) ঘাড়ে ন্যস্ত করেই সমাজ তার সংহতি বজায় রাখে। কারণ, আমরা আগেই দেখেছি যে, আইনের প্রয়োজনীয়তার ধারণাটি তখনই বলবৎ হয়, যখন তাকে অতিক্রম (Tansgress) করার প্রবণতাটি রীতিমতো স্পষ্ট ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।

এবার ফিরে আসা যাক আলি-র কথায়। আলি এবং তার মতো অন্যান্য আরব অভিবাসীদের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ তাদের যৌন-অতিসক্রিয়তা, যা প্রায়শই (জার্মানদের মতে) ন্যায়নীতির গণ্ডী অতিক্রম করে যায়। এখন, এই ধরণের যৌনসক্রিয়তা (যা কিনা, এমন কি, বয়সের বাছবিচারও করে না!!) একজন গড়পড়তা জার্মানের কাছে নিষিদ্ধ,

একরকমের ট্যাবু-ই, কারণ যে সমাজে সে বসবাস করে সেই সমাজ এইধরণের কামনাগুলিকে অনুমোদন করে না, বরং অবদমিত করতে চায়। কিন্তু একই সঙ্গে এই অবদমনের প্রক্রিয়াটি যাতে দৃশ্যমান না হয়, তার জন্যে সমস্ত দায় চাপিয়ে দেয় অভিবাসী 'অপর'-এর ওপর। এই 'অপর' পক্ষই হাতিয়ে নিয়েছে সেই অপরিমিত যৌনসম্ভোগের চাবিকাঠি, যা *আমাদের* হাতে থাকলে আমরাও *হয়তো* এই সম্ভোগের অংশীদার হতে পারতাম (লক্ষ্য করুন, এখানে *আমাদের* মধ্যেও লুকিয়ে আছে সামাজিক আইন ভাঙার একটা সুপ্ত প্রবণতা, এবং এই গোপন ইচ্ছাটাই আইনের কার্যকারিতাকে বৈধতা দিচ্ছে)। এইরকম আক্ষেপ ক্রমশ পরিণত হয় ঘৃণায়, এবং ফলত, চলমান রাখে বর্ণবিদ্বেষী কাঠামোটিকে।

এই আপাত-অদৃশ্য ঘটনাটি কিন্তু ততটা দুর্লক্ষ্য থাকে না, অন্তত এমি-র কাছে। সে সহজাত বুদ্ধিতে পারে সমস্ত ক্রিয়াকান্ডের স্বরূপ। তাই, একসময়ে সে সোচ্চারভাবে তার প্রতিবেশিনীকে বলে ''ঈর্ষা! আসলে আমাকে তোমরা ঈর্ষা করো। হিংসে করো আমার সুখকে।'' মোক্ষম জায়গায় আঘাত করে তার বাক্যবাণ। প্রতিবেশিনীর মুখে আর কথা যোগায় না। সে শুধু বলে, ''ঈর্ষা! শোনো কথা একবার!''

৩

আমরা দেখি যে গোটা ছবিটিতেই আলি নিজেকে উল্লেখ করে উত্তমপুরুষে নয়, তৃতীয় পুরুষ একবচনে। আপাতভাবে, এটা আলির অপটু জার্মান ভাষাজ্ঞানের ফলশ্রুতি বলে মনে হলেও এর পেছনে একটি ব্যাপকতর সম্ভাবনার হাতছানি থেকেই যায়।

ছবিতে আমরা আলির যে রূপটি প্রধানত দেখি, যে অভিবাসী, যে কঠোর কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে, ভাঙাভাঙা জার্মান বলে এবং যে বিশুদ্ধ জার্মানদের ঘৃণা ও

সন্দেহের পাত্র, সেটাই তো তার একমাত্র পরিচয় নয়। ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সংস্কৃতিতে এ তার প্রক্ষিপ্ত রূপমাত্র; জার্মান 'আত্মন'-এর সঙ্গে অভিবাসী 'অপর'-এর বিভাজনরেখাটিকে অদৃশ্য প্রতিপন্ন করার একটা অসম্ভব প্রায়াস। 'আত্মনে'র নকলনবিশী, 'অপরে'র কাছে একটি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা, একধরণের মিমিক্রি। কারণ সে মনে করে, হয়তো হাবে-ভাবে বিশুদ্ধ জার্মান হয়ে উঠতে পারলেই তাকে আর প্রাত্যহিক অপমান ও বঞ্চনার শিকার হতে হবে না। ছবি থেকে একটি উদাহরণ দিই — এমির বাড়ির সামনের দোকানদারটি গোড়া থেকেই আলির সঙ্গে অসহযোগিতা করতে শুরু করেছিল। আলি কী চাইছে সেটা বুঝতে পেরেও সে অন্য জিনিশ এগিয়ে দিচ্ছিল, যেন আলির ভাষা সে বুঝছেই না। অবশেষে তিতিবিরক্ত ভাবে সে আলিকে বলে, ''যাও, যাও, আগে জার্মানটা ঠিকঠাক বলতে শেখো, তারপর এসো জিনিশ নিতে।'' ভাষা না জানার ছুতোয় এই যে অপমান, আলির মতো অভিবাসীরা ভাবে, পরিষ্কার জার্মান বলাই (অথবা জার্মান আদবকায়দায় চোস্ত হয়ে ওঠাই) বোধহয় এ থেকে মুক্তির পথ। এইভাবে 'অপরে'র মৌল সত্তাটি আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে।

অথচ, এই প্রক্ষিপ্ত রূপের আড়ালে, আলির আরেকটি চেহারাও মাঝেমধ্যেই আমাদের সামনে চলে আসে, যে আলি আদ্যন্ত মরোক্কান, যার শিকড় আরব সংস্কৃতির গভীরে প্রোথিত। বিশেষত, যখন সে 'কুস-কুস' (একটি আরবি রান্না করা খাবার) খাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে, অথবা ঘন্টার পর ঘন্টা একটি ছোট্ট বারে বসে আরবি গানবাজনা অভিবাসী-জীবনের দিনগত পাপক্ষয়ে তার সত্তার এই দিকটি আড়ালে চলে যায়। বলা যায়, 'আত্মন'কে নকল করার তাগিদে সেই ক্রমশই বিযুক্ত হতে থাকে তার দেশজ ঐতিহ্য থেকে, তৈরি হয় একটি দো-আঁশলা অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বকে আলি মেনে নিতে পারে না বলেই, সে নিজেকে নাম ধরে,

তৃতীয় পুরুষ একবচনে সম্বোধিত করে, যেন এই অস্তিত্ব আসলে তার নয়, সে যেন কিছুতেই নিজের সঙ্গে একাত্মবোধ করতে পারে না।

অর্থাৎ, যে বিভাজন প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল একটি কাল্পনিক 'অপরে'র নির্মাণের মধ্যে দিয়ে, তা অন্তিমে সেই 'অপর'কেই বিযুক্ত করে তার নিজস্বতা থেকে, এবং ক্রমশ আত্তীকৃত করে নিতে থাকে নিজের ভিতরে, অবশ্যই সমাজের মূলস্রোতে নয়, বরং একটি প্রান্তিক অবস্থানে। 'অপর' কিন্তু বিলুপ্ত হয় না, এবং 'আত্মনে'র সঙ্গে তার মূলগত দ্বন্দ্বটিও অব্যাহত থাকে। কেবল ভেঙে দেওয়া হয় 'অপরে'র দাঁত-নখ, তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। কেননা তখন তার নিজস্বতা বলতে আর কিছুই থাকে না; সে সর্বার্থেই, তখন, 'আত্মনে'র কৃপাপ্রার্থী।

এই কারণেই, ছবির শেষদিকে অসুস্থ, অচৈতন্য আলির পাশে এমি-কে এসে দাঁড়াতে দেখে, তাদের প্রেমকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া সত্ত্বেও, আমাদের যেন মনে হতে থাকে এই সম্পর্কের মধ্যে কোথাও একটি দাক্ষিণ্যের বোধ মিশে রয়েছে, যেন তা উর্ধ্বতন-অধস্তনের হায়ারার্কি দ্বারা নির্ণীত, শেষ অবধি।

আলি এখনও, এখানে, আমাদের মধ্যে

বিযুক্তির এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি দেশকালনিরপেক্ষ। সংখ্যালঘু মানুষদের, সমাজের ক্ষমতাকেন্দ্রগুলি এইভাবেই একটি প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিয়েছে, বারবার। এমন কী, আমাদের দেশেও, সাম্প্রতিক সময়ে হিঁদুয়ানির ধারাবাহিক উত্থানে, ক্রমবর্ধমান মুসলিম-বিদ্বেষে এই বিযুক্তির বয়ানটিই প্রচ্ছন্নে বা প্রকাশ্যে ক্রিয়াশীল। আবার এর প্রতিক্রিয়ায়

মুসলিম উগ্রপন্থাও হাতিয়ার হিসেবে 'আমরা-ওরা'র বিভাজনটিকেই সামনে নিয়ে আসে। সে সব, আপাতত, আমাদের এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধের আওতার বাইরে। এখানে শুধু এটুকুই বলার যে, ফাসবিন্ডারের *'আলি: ফিয়ার ইটস দ্য সোল'* বারবার আমাদের সতর্ক করতে থাকে বিযুক্তিকরণের এই ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে, আর সেখানেই এর তাৎপর্য একই সঙ্গে চিরকালীন ও সার্বজনীন।

তথ্যসূত্র

১. Zizek, S. (1989) *The Sublime Object of Ideology*, London: Verso
২. ..... (1994) *The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Women and Causality*, London : Verso
৩. Homer, Sean (2005) *Jacques Lacan*, Oxfordshire: Routledge
৪. Savage, Julian (2001) *The Conscious Collusion of the Stare*: *The Viewer Implicated in Fassbinder's 'Fear Eats the Soul'*, Available on *http://www.sensesofcinema.com/contents/cteq/01/16/fassbinder fear.html.*